Shyamal Sen
1969

শ্রীযুক্ত জগৎকান্ত শীলের জীবনালেখ্য

জন্ম

আদি কলিকাতার প্রাচীনতম পল্লী মধ্য কলিকাতার ছুতারপাড়া ও সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত ১৮নং গৃহে ৺বঙ্কুবিহারী শীলের দ্বিতীয় পুত্র জগৎকান্ত ১৯০৩ সালে ভূমিষ্ঠ হন।

বাল্যে

অত্যন্ত শিশু অবস্থা হইতেই জগৎকান্তের স্বভাব ছিল দুরন্ত প্রকৃতির। শারীরিক বল সমবয়সী অন্যান্য বালকদের তুলনায় বেশী থাকাতে তাঁহার সহিত একক বা যুগ্মভাবে তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ক্রমে শিশু যতই বর্ধিত হইতে লাগিল, তাঁহার পটুতা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং স্বভাবতই খেলার প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইল।

কৈশোরে

ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিতেই পিতা তাঁহাকে বহুবাজার হাই স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। কিন্তু শুরু হইতেই দেখা যায়—পড়াশুনা তাঁহার নিকট গৌণ এবং খেলাধুলাই প্রধান। বহু সাবধানবাণী ও অতঃপর গৃহে ও স্কুলে অসাধারণ নির্যাতন তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়, কিন্তু তাঁহাকে মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে বিরত করা যায় নাই। এইভাবেই তিনি বৎসরান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইতে থার্ড ক্লাশে (এখনকার অষ্টম মান শ্রেণী) উঠিলেন, তখন তাঁহার ফুটবল খেলার প্রতি প্রীতি তাঁহাকে স্কুলের একটি দল গঠনে অনুপ্রাণিত করিল। তখনকার দিনে অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসর আগে বাঙালী-পাড়া অঞ্চলের কোন স্কুলেই ফুটবল অথবা অন্য কোন খেলার দল ছিল না এবং স্কুল কর্তৃপক্ষরাও ছাত্রদের দৈহিক অনুশীলনের প্রতি মনোযোগ বা উৎসাহদান করাকে কর্তব্য জ্ঞান করিতেন না। ইহার কারণ হয়ত সে যুগের অভিভাবকরা তাঁহাদের পুত্রদের খেলা পছন্দ করিতেন না, উপরন্তু খেলায় উৎসাহী বালকদের মানা করিতেন, ভীতি-প্রদর্শন করিতেন যে, খেলিলে হাত-পা ভাঙিবে, লেখাপড়া হইবে না। জগৎকান্তের প্রকৃতি ভয়কে দূরে পরিহার করিত।

তিনি অপরপক্ষে কয়েকটি বালকদের বেশ কিছুদিন ধরিয়া সাহস যোগাইতে লাগিলেন। তাঁর অধ্যবসায় কার্যকরী হইল। তিনি একটি দল গঠন করিলেন এবং সেই দল লইয়া পাড়ায় বে-পাড়ায় ম্যাচ খেলাইতে লাগিলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ কোন সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাঁর চেষ্টাকে দমন করিবার জন্য তাঁহাকে নিত্য-নৈমিত্তিক তিরস্কার করিতে শুরু করিলেন কিন্তু জগৎকান্ত হাল ছাড়িলেন না। পর বৎসর উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকটি ছাত্রের মুখপাত্র হইয়া প্রধান শিক্ষকের নিকট স্কুল টীম গঠনের দাবী পেশ করিলেন। সে দাবী মঞ্জুর হইল না। কিন্তু জগৎকান্ত ক্ষান্ত হইলেন না। টীম তৈরী করিলেন এবং নিজের চেষ্টায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া খেলা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়কার সংগঠনস্পৃহা যাহা অঙ্কুরিত হইল, নানান বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া তাহাই ভবিষ্যতে মহীরুহে পরিণত হইল। সে পরিচয় আমরা পরে পাইব।

যৌবনে

শক্তিমানের সহিত লড়াই করিতে করিতে জগৎকান্ত ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হইলেন, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পথে।

কলেজ-জীবন জগৎকান্তের জীবনে ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পরিবর্তে আয়ত্ত হইল নিজেকে ক্রীড়াজগতে প্রতিষ্ঠা করার অদম্য উদ্দামতা। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সভ্য হইলেন। প্রথমে উক্ত বিখ্যাত ক্লাবের দ্বিতীয় টীমে খেলা সুরু করিয়া প্রথম ডিভিসনের লীগ টীমে স্থান করিয়া লইলেন। এই সঙ্গে কিছু কিছু ক্রিকেট ও অন্যান্য বহির্বিভাগের খেলায় পারদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন। এ পর্যন্ত কোন ক্রীড়াবিশারদের নিকট তিনি শিক্ষালাভের সুযোগ পান নাই। যুদ্ধোত্তর যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সময় বহুবিধ বহির্বিভাগের ক্রীড়ায় বাঙলার সন্তানরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিতে পারেন নাই। তার মধ্যে দীর্ঘপাল্লার দৌড়ই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়। জগৎকান্ত ইতোমধ্যে পাড়াপড়শী অল্পবয়সীদের নিকট 'জগাদা'য় পরিণত হইয়াছেন। অন্যে যাহা করিতে অক্ষম, সে কাজে অসম সাহসী জগা শীর্ণ এগিয়ে আসবে —এই ছিল তার ভাগ্যলিপি। তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তাঁর উদ্দামতা তাঁকে দূরপাল্লার দৌড়ে টেনে নিয়ে গেল। প্রথমে পাঁচ মাইল, পরে দশ মাইল দৌড়ে একমাত্র বাঙালী, যিনি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে লাগিলেন।

প্রস্তুতিতে

জগৎকান্তের পূর্ণ যৌবনের কয়েকটি বৎসর আনুমানিক ১৯১৯ থেকে ১৯২৬ একদিকে তাঁর নিজেকে সবরকম খেলায় উপযুক্ত করে তৈরী করতে যেমন কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তেমনি ওই সময়েই তিনি বহু জ্ঞানী-গুণী ও সদাশয় ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে নিজেকে কষ্টিপাথরে যাচাই করে একটি 'পূর্ণ মানুষে' পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান যে সাহায্য একজন পুরোদস্তুর খেলোয়াড় হতে হলে পাওয়া দরকার, তার সে সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং যা কিছু করতে হয়েছে তাঁর অনু-শীলনের জন্য, সবই অত্যন্ত কঠিন শ্রমের বিনিময় এবং যোগাড়-যন্তর করে। যেমন, সবরকম খেলা কিছু কিছু আয়ত্তে আসার পর তিনি অনুভব করলেন যে, ব্যাপারটা খাপছাড়া হচ্ছে। অতএব নিয়মমাফিক অনুশীলন করার পদ্ধতি দখলে আনতে হবে। কি করে হয়? সে যুগে এমন কোন পদ্ধতির সন্ধান

বাঙলাদেশে খুঁজে পাওয়া গেল না। পরন্তু সন্ধান পেলেন যে, জগদ্বিখ্যাত ব্যায়ামশিক্ষক ডাঃ এচ, ডব্লিউ, বাক্ আমেরিকা হইতে আসিয়া মাদ্রাজের অনতি-দূরে রয়াপেটা গ্রামে স্কুল অব ফিজিক্যাল এডুকেশন নামে ছাত্রদের শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছেন। অতএব জগৎকান্তকে এ সুযোগ নিতে হবে। হবে বললেই তো হয় না। কিন্তু দমবার পাত্র নন তিনি। ঠিক যোগাড় করে নিলেন সংস্থান। আর তা পেরেছিলেন বলেই শুধু তাঁর নয়, সমগ্র দেশেরই মঙ্গল সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯২৩ ও তার পরবর্তী ২৪ সাল এই দু বছর ডাঃ বাকের স্কুলের ছাত্র থেকে ফিরে এলেন প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা নিয়ে।

কর্মজীবনে

জগৎকান্তের কর্মজীবন কয়েকটি বিশেষ ভাগে ধরা যায়। (ক) চাকুরী, (খ) ক্রীড়া পারদর্শিতালাভ, (গ) সংগঠন ঈপ্সা, (ঘ) সংযোজন এবং (ঙ) যোগাযোগ।

চাকুরী

পিতা বঙ্কুবিহারী পুত্রের ক্রীড়া-প্রবণতা লক্ষ্য করে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাকুল হয়ে যখন প্রচণ্ড তিরস্কার করেও তাঁর মতিগতি ভিন্ন পথে চালিত করে দিতে সক্ষম হলেন না, তখন অনন্যোপায় হয়ে তাঁর নিজ চাকুরী-স্থলে ইংরেজ মালিক এনড্রু ইউল কোম্পানীতে পুত্রকে প্রবিষ্ট করাইলেন। জগৎকান্ত পিতার বাধ্য সন্তান, দশটা—পাঁচটা অফিস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পিতার অজ্ঞাতসারে যখনই তাঁর খেলায় যোগদানের ডাক পড়িত, তিনি অফিস নিয়মভঙ্গ করিয়া মাঠে দৌড়াইতেন। প্রথম প্রথম নজর এড়াইয়া এইভাবে খেলা চালাইতেছিলেন কিন্তু বেশীদিন ব্যাপারটি চাপা রহিল না। উপরওয়ালার নজরে আসিল। ধমক খাইলেন। বিরক্ত হইলেন। পরে চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন। তারপরে কলিকাতা কর্পোরেশনের পার্ক ফিজিক্যাল ডাইরেক্টর এবং পর পর অক্টোভিয়াস স্টীল কোং, জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন, বাটা সু কোং এবং অবশেষে আবার কলিকাতা কর্পোরেশনে। শেষোক্ত অফিস হইতে ১৯৬৭-র অক্টোবর মাসে পরিণত বয়সে অবসর গ্রহণ করেন।

ক্রীড়া-পারদর্শিতা লাভ

মোহনবাগানে ফুটবল খেলাকালীন জগৎকান্ত অন্যান্য খেলায়ও অংশগ্রহণ করিতেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দুটি বিষয়। প্রথম মুষ্টিযুদ্ধ ও দ্বিতীয়, দীর্ঘপাল্লার দৌড়। মুষ্টিযুদ্ধের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দুটি কারণে। স্বভাবতই মুষ্টিযুদ্ধ শক্তিমত্তার চরম নিদর্শন বলিয়া তাঁর নিকট প্রতিভাত হইল। আর তখনকার দিনে বাঙালীদের হীনবলের লজ্জাকর দুর্ণাম তাঁর অন্তরে আঘাত হানে। অর্ধশতাব্দী পূর্বে সাহেবপাড়ায় বাঙালীদের যাতায়াত নিষিদ্ধ না থাকিলেও, বিপদসঙ্কুল ছিল। গোরারা তো বটেই, ইংরেজরা এবং তাদের দেখাদেখি ফিরিঙ্গীরাও (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান) কারণে অকারণে বাঙালী দেখিলেই পিটিতে সুরু করিত। গোরাদের ঔদ্ধত্য এত উঁচুতে উঠিয়াছিল যে, চৌরঙ্গী অঞ্চলে আজ যে স্থলে মেট্রো সিনেমা ও গ্র্যান্ড হোটেলের বারান্দার নীচে বাঙালীদের একক পাইলে হাতের বেত দিয়া মারিত। প্রতিবাদ করিলে সবুট লাথি মারিতেও কসুর করিত না। জগৎকান্তের পক্ষে এই অবস্থা মানিয়া নেওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। তিনি পণ করিলেন আমরাও শক্তিশালী হইব এবং শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে শক্তির লড়াইয়ে মোকাবিলা করিব। কি করিয়া করা যায়? বহুদিনের নির্বীর্যতাকে তো আর মুখের কথায় সজীব করা যায় না! তাই তিনি ডাঃ বাকের নিকট অধীত বক্সিং নিজেই অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন শিক্ষক নাই।

ইতোমধ্যে বাঙালীদের পুরোধা হিসাবে দশ মাইলের দীর্ঘপাল্লার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া হুতবল বাঙালীদের মনে আশার আলো সঞ্চার করিয়াছেন।

দীর্ঘপাল্লার দৌড় ও বক্সিং দুই-ই একসঙ্গে চলিতে লাগিল।

যদিও দূরপাল্লার দৌড়ে সুনাম অর্জন করতে লাগলেন ও অন্যান্য খেলায়ও বেশ দখল এল কিন্তু মন তাঁর অশান্ত রয়ে গেল, কেননা তাঁর স্বপ্ন বক্সিং এখনও তাঁর করায়ত্ত হয়নি। উঠে পড়ে লাগলেন। নিজে একা একা এ খেলা চলে না। চাই প্রতিদ্বন্দ্বী। চাই অনুশীলন করবার জন্যে সহযোগী। এইখান থেকে শুরু হল জগৎকান্তের ভিতরে যে গঠনস্পৃহা স্কুলজীবনে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তারই স্ফুরণ তিনি আর দুজন বাঙালী যুবক ও একজন নেপালী যুবককে বক্সিং-এ অনুপ্রাণিত করে ওয়াই, এম, সি, এ, কলেজ স্ট্রীট ব্রাঞ্চে প্রতিদিন বিকালে অনুশীলন করতে লাগলেন। কিছুদিন এইভাবে নিজেরা শেখবার চেষ্টা করে যদিও কার্যক্ষেত্রে লড়বার উপযোগী হননি কিন্তু বক্সিং-এর নেশা এদের সকলকেই পেয়ে বসল। এইবার জগৎকান্ত শিক্ষক খুঁজলেন। পেলেন না। তবে তৎকালীন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের মিঃ ফিসারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। এই ইংরাজ ভদ্রলোক নিজে মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন না কিন্তু শখের আগ্রহ দেখে তিনি নিজেই তাঁর বক্সিং সম্বন্ধে যা পূর্বার্জিত জ্ঞান ছিল, তারই সাহায্যে এই চারটি উৎসাহী যুবককে শিক্ষাদান করতে লাগলেন।

এই হোল ভারতবিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জগৎকান্তের বক্সিং-এ হাতে-খড়ি।

সংগঠন

সংগঠনস্পৃহা বক্সিং শেখার মাধ্যমেই জগৎকান্তের মধ্যে বিকশিত হয়। ফলে তিনি ১৯২৫ সালে পাড়া-সম্পর্কে দাদা ইন্ডিয়ান অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী শ্রী পি, মিত্র (কালু) শ্রী বি, এন, দাস, ডাঃ এস মুখার্জী, পি কে সাউ, সন্তোষ দত্ত, এস সি দত্ত প্রমুখের সহযোগিতায় স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচারের গোড়াপত্তন করলেন আর সেই বছরই তাঁর পাঁচ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতারও প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান করা হল।

স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচার বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই প্রথমদিকে ছিল না। ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের সহৃদয়তায় ১২৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের প্রাঙ্গণে মাটিতে চারপাশে চারটি খুঁটি পুঁতে আর দু প্রস্ত দড়ি দিয়ে ঘিরে একটি বক্সিং রিঙ তৈরী হল। পত্তন হল কলকাতায় পুরোদস্তুর বাঙালীদের বক্সিং শিক্ষার কেন্দ্র। এই রিঙেই জগৎকান্ত তদানীন্তন পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মিলটন কিউবসকে নিয়ে এসে যথাযোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

বক্সিং-এ ছাত্র পাওয়া মুস্কিল অথচ স্কুল করা হয়েছে। জগৎকান্ত তখন ডাঃ বাকের নিকট শেখা ডাম্বেল ও মুগুর ড্রিল আরম্ভ করলেন। কাঠের ডাম্বেল ও কাঠের ছোট ছোট মুগুর জগৎকান্তের শিক্ষায় যে ড্রিল দল গড়ে উঠল, তাদের ড্রিল দেখবার জন্য কাতারে কাতারে লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত, কখন আরম্ভ হবে সেই আশায়। অপূর্ব ছিল তাঁর ছন্দ, ভঙ্গীমা আর সেই সঙ্গে কাঠের ডাম্বেলগুলি দিয়ে পরস্পর আঘাত করা হোত তার ঠোকাঠুকিতে যে সংগীতের সূচনা হোত তার মূর্ছনা আজও অনেকের কানে বাজে। এই ড্রিলের দল থেকেই জগৎকান্ত চয়ন করেছিলেন, তাঁর ছোট বক্সিং দল।

স্কুল তো হোল। এইবার চাই বক্সিং-এর প্রচার যাতে দলে দলে বাঙালীর ছেলেরা বক্সিং শেখে।

একটি ছোট্ট দল তৈরী করলেন। মাত্র দু-তিনটি বাঙালী ছেলে। তাঁদের নিজে শেখালেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইংরেজদের স্কুল থেকে ওইসব ছেলেদের প্রতিদ্বন্দ্বী যোগাড় করলেন। সাহেবদের সঙ্গে বাঙালীদের লড়াই। ভয়ানক ব্যাপার। যেখানে যত জলসা হত, ডাক পড়ত জগৎকান্তের 'লড়ুইয়ে' দল নিয়ে যাবার জন্যে। এইরকম প্রদর্শনীতে বক্সিং দেখবার জন্যে অসাধারণ জনসমাবেশ হত। টিকিট বিক্রি হত প্রচুর। আস্তে আস্তে ভয় কাটতে লাগল। জগৎকান্ত এই ভয় কাটাবার জন্যে কলকাতায় যখন কোন বক্সিং প্রোগ্রাম হত (সাধারণতঃ গ্লোব সিনেমা, এম্পায়ার সিনেমা, কিং কার্নিভ্যাল, মট কার্নিভ্যাল, সেলার্স সার্কাস, রয়েল সার্কাস, কারসন সার্কাস ইত্যাদিতে হত) জগৎকান্ত সেইসব প্রোগ্রাম যাতে তাকে নেওয়া হয় সে চেষ্টা করতেন। কিন্তু পরিচালনা সে সময় সব সাহেবদের হাতে ভেতো, ভীতু বাঙালী আবার বক্সিং লড়বে কি, এই অজুহাতে গোড়ায় গোড়ায় তাঁকে স্থান দিত না। প্রতিভা যার আছে, তাকে কি চেপে রাখা যায়! ক্রীক রো নিবাসী এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মিঃ লরেন্সের নজর শীলের উপর পড়ে। তিনি উঠে-পড়ে লেগে কয়েকটি লড়াইয়ের ব্যবস্থা করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ইংরেজ, নয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এইসব লড়াই-গুলির প্রায় সবগুলিতে জগৎকান্ত বিজয়ী হন আর তার ফলে আর জগৎকান্ত নয়, জে, কে, শীল এই নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এইবার আসতে লাগল ডাক তাঁর কাছে। তিনিও সাড়া দিলেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪ এই ক'বছর সার্ধ ১৫০টি লড়াইয়ে তিনি যোগদান করেন। হারেন মাত্র ১২।১৩টি লড়াইয়ে। জে, কে, শীল তখন কলকাতা তথা ভারতবর্ষের বক্সিং-এ একটি শীর্ষ নাম। বাঙালীর গৌরব।

নিজে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছলেন আর সেই সঙ্গে তাঁর জীবনের স্বপ্ন স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচার, যা ইতোমধ্যে কয়েক বছর ধর্মতলার কলিন্স ইনস্টিটিউট থেকে বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসেছে। বর্তমান স্কুল প্রাঙ্গণটি জে, কে, শীল কর্পোরেশনের কাছ থেকে পেয়েছেন ঠিকই কিন্ত পাওয়ার পিছনে জে, কে, শীলের আর একটি সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ হয়। সেটি হচ্ছে যোগাযোগ করা ও কাজ আদায় করা। তদানীন্তন মেয়র নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জে, কে, শীল বক্সিং ও শরীরচর্চার উপকারিতা সম্বন্ধে অবহিত করেন। নেতাজী জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে জে, কে, শীলের চার্লি রীডকে চ্যালেঞ্জ করে যে সাহসিকতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে খুবই আশান্বিত হয়েছিলেন। ফলে জে, কে, শীলের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণটি স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচারকে বিলি ব্যবস্থা করে দিতে। করলেনও।

জে. কে, শীল আর অপেক্ষা করলেন না। কাজে নেমে পড়লেন। সেই বছরই আন্তঃস্কুল বক্সিং প্রতিযোগতার উদ্বোধন করালেন। তাঁর অনলস চেষ্টায় দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই ঐ প্রতিযোগিতায় বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতি-দ্বন্দ্বীরা যোগদান করতে এল। ক্রমান্বয় চল্লিশ বৎসর চলছে সেই প্রতিযোগিতা আর তার ফলে দিকে দিকে আলোড়ন জেগেছে বাঙালী ছেলেদের মধ্যে। জে, কে, শীলের আজীবনের সাধনা পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছে।

এ তো গেল মুষ্টিযুদ্ধের কথা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নাম রেখেছেন ফিজিক্যাল কালচার। দৈহিক চর্চা। ড্রিল ও মুষ্টিযুদ্ধ তো অঙ্গীভূত। এইবার স্কুলের প্রসারে মনোনিয়োগ দরকার। শরীর গঠনের জন্য ব্যায়ামাগার চালু হল।

আস্তে আস্তে ডাম্বেল, বারবেল সংগ্রহ হল। কুস্তার আখড়া তৈরী হল। হোরাইজণ্টাল বার ও রোমান রিঙ খাটান হল।

এই করেই ক্ষান্ত হলেন না। বাঙালীর ভবিষ্যৎ সন্তানদের সবল শরীর হোক এই চিন্তা তাঁর মনকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, তিনি একখানি পুস্তিকা রচনায় মনোনিবেশ করলেন, যার মাধ্যমে তখনকার দিনের শ্রমবিমুখ বালক ও যুবকরা অতি অল্প আয়াসে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। সক্ষম হলেন একখানি অপূর্ব পুস্তক প্রকাশ করতে, দামে সস্তা নামে চমৎকার 'শরীর সামলাও'। পরে খালি হাতে ব্যায়ামের একখানি চিত্রসম্বলিত চার্টও বার করলেন। যুগপৎ এত চেষ্টা তাঁর ফলদায়িনী হল। দলে দলে উৎসুক ছাত্ররা তাঁর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করতে উপস্থিত হল। তিনিও সানন্দচিত্তে তাদের অনুশীলন পদ্ধতি শেখালেন আর সেই সঙ্গে কয়েকজন উদীয়মান তরুণকে বিশেষভাবে তৈরী করতে লাগলেন, যারা ভবিষ্যতে শারীরবিদ হয়ে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে ছাত্র তৈরী করতে।

শেষোক্ত কাজটি আরও সুষ্ঠুভাবে করলেন তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানে শীতকালীন ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করে। এই ক্যাম্পে বাঙলার বিভিন্ন জেলার স্কুলগুলি থেকে ক্রীড়াশিক্ষকরা আসতেন নিয়মমাফিক পদ্ধতিতে (সিস্টেমেটিক) শিক্ষাগ্রহণ করতে। যে কয়েক বছর এই ক্যাম্প ছিল, তাতেই কাজ হয়েছিল। পরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষক তৈরীর শিক্ষা নীতিগতভাবে গৃহীত হয়।

তাঁর প্রতিষ্ঠানে রাত্রিকালীন টেনিস খেলার ব্যবস্থাও করেছিলেন। একবার জগৎবিখ্যাত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় ফ্রান্সের র‍্যামিলকে এনে ফ্রান্সেরই তদানীন্তন তিন নম্বর খেলোয়াড় দুগ্লের সঙ্গে কয়েক সেট খেলার আয়োজন করেছিলেন। বিশ্ব টেনিস ইতিহাসে এইটেই প্রথম পেশাদারের সঙ্গে অপেশাদারের খেলা। পরে এই স্কুলের প্রাঙ্গণেই আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেঙ্গল রোড রেস অ্যাসোসিয়েশন, ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাব ও ভেটারেন্স ক্রিকেট ক্লাব। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্রদের সঠিক পদ্ধতিতে ক্রিকেট খেলা শেখানোর উদ্দেশ্যেই গঠিত করেন তিনি। স্কুলের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে আজও কয়ার ম্যাটিং-এ তিনদিকে জাল পরিবেষ্টনে পীচ আছে।

শিক্ষকতায়

জগবন্ধু ইনস্টিটিউসন ও কলিকাতা কর্পোরেশনের পার্ক ব্যায়ামশিক্ষকতা তিনি বেশ কিছুদিন করে তারপরে নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতি নজর দেন। ব্যায়াম ও মুষ্টিযুদ্ধ শেখান ছাড়াও তিনি ফুটবল শিক্ষকরূপেও অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৯৩৭ সালে এরিয়ান ক্লাবের কোচ হিসাবে তিনি ডুরাণ্ড কাপে টীম নিয়ে যান। তখনকার দিনে ডুরাণ্ড কাপ সিমলা পাহাড়ে ৭৬০০ ফুট উঁচুতে কাইথু নামে অভিহিত স্থানের আনানডোল মাঠে খেলা হত। সমতলভূমির ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের খেলোয়াড়েরা স্বভাবতই সিমলার শীতে কাবু হয়ে পড়ার কথা, কিন্তু তাঁর নিরলস শিক্ষাদান এরিয়ান ক্লাব খেলোয়াড়দের এত উজ্জীবিত করেছিল, যে, তারা বাঘা বাঘা মিলিটারী টীমদের পরাভূত করে সেমি-ফাইন্যালে উপনীত হয়। তাঁর ফুটবলে শিক্ষাদান ফলপ্রদ জেনে বাটা সু কোম্পানি তাঁকে তাঁদের কোচ করে নিয়ে যান। তাঁর শিক্ষাদান সফল হল বাটা কোম্পানি বোম্বাই থেকে বিখ্যাত রোভার্স জয় করে কলকাতায় আনল। তারপরে তিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কোচরূপে যোগদান করেন এবং বহু বর্ষ ধরে শিক্ষাদান করেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে শিক্ষাদানের প্রথম বর্ষেই ১৯৪১ সালে তিনি ক্লাবকে তাদের ইতিহাসে প্রথম লীগ পাওয়াতে সক্ষম হন।

সংযোজনায়

এই একটি জগৎকান্তের চরিত্রের আর একটি বিভাগ, যে বিষয় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, যাকে ইংরাজীতে বলতে হয় পাস্ট মাস্টার।

বিশ সালের কিছু আগে থেকেই তিনি প্রথমে পাড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তার মধ্যে উল্লেখ করতে হয় ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্র ও শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এঁরা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং সেইজন্য যখনই জগৎকান্ত তাঁদের কাছে কোন প্রস্তাব নিয়ে

যেতেন, তা অযৌক্তিক হলেও ওঁরা যেহেতু জগৎ চাইছে, তখন মত দিতে হবে, প্রয়োজনে অর্থও।

জগৎকান্তের ১৯।২০ বয়সের সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন রকমের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁর এক কীর্তি চাঁপাতলা মীর্জাপুর পার্কে ব্রিটিশ গোরা রেজিমেন্ট ফুটবল টীম এনে খেলান। তখনকার দিনে কল্পনাই করা যেত না একেবারে বাঙালী পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে গোরাদলের আমদানী। কিন্তু জগৎকান্ত পৃথিবীতে এসেছিলেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে। দুর্দ্ধর্ষ সাউথ ওয়েলস বরডারার্স টীমকে যার গোলে পৃথিবীখ্যাত হস্‌কার, ব্যাকে ফেনার ইত্যাদি ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে এলেন ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেণ্ট থেকে। আনার খরচ এবং খেলার পর তাদের আদর আপ্যায়ন উক্ত পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা করলেন। পাড়ায় সে কি উন্মাদনা। মাঠ তো ওইটুকু। গোলপোস্ট নেই। তাতে কি হয়েছে। বাঁশ দিয়ে পোস্ট আর নারকেল দড়ি দিয়ে বার। গোরারা হেসেই খুন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে জগা শীল তাঁর বন্ধুদের মধ্য থেকে সবই পাড়ার যুবক এমন টীম খাড়া করলেন, যারা দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেইসব সমালোচক যাঁরা আগে বলেছিলেন, হ্যাঃ বাঙালী ছেলেরা আবার আসল গোরার সংগে খেলবে। হেরে ভূত হয়ে যাবে। অতি সামান্য গোলের ব্যবধানে হেরে সেইসব মুখর সমালোচকদের মুখই বন্ধ করলেন না, তাদের কাছ থেকে তাগিদ আসাতে বাধ্য করলেন ওইরকম খেলার আরও আয়োজন করার জন্য। তাদের কথা রেখেছিলেন কয়েক বৎসর ধরে মীর্জাপুর পার্কে (অধুনা শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) ক্যামেরন হাইল্যান্ডার্স, রয়াল গ্যারীসন আর্টিলারি এবং কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম এবং ব্যারাকপুর থেকে মিলিটারী টীম এনে খেলার নিয়মিত অনুষ্ঠান করতেন।

এইরকম খেলার ব্যবস্থা তখনকার দিনে মোটেই সামান্য ব্যাপার ছিল না। প্রথমতঃ ফোর্টে ঢোকার অনুমতি পাওয়াই এক কঠিন সমস্যা, তারপর যোগাযোগ। ফোর্টের বাইরে মিলিটারী আনা তার লাল ফিতার কড়া বাঁধা। সর্বোপরি খরচ বহন। মাঠ তৈরী, টীম গঠন তো আছেই।

কিন্তু এই সংযোজনা করার ফলে জগৎকান্ত এমনভাবে নিজেকে তৈরী করলেন যে, ভবিষ্যতে অগণিত বৃহদাকারের অনুষ্ঠান নিখুঁতভাবে শুধু সম্পন্নই করেননি, সেইসব প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মহলের শীর্ষস্থানীয় নমস্য ব্যক্তিদের এনেছেন সভাপতি করে। মহারাজা অব সন্তোষ, স্যার রাজেন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডাঃ বি সি রায়, বাঙলার গভর্নর কে নন—যাঁর কাছেই জগা শীল উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর এস, ও, পি, সি-তে আসার নিমন্ত্রণ করতে, তিনিই হৃষ্টচিত্তে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। এমনকি তদানীন্তন কালে যখন দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরম শিখরে উঠেছিল, তখনই শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসে "হিন্দুস্থান ন্যাশানাল গার্ড" নামে একটি সংগঠন তৈরীর মনস্থ হ'লো। তাঁহার সেই সংগঠনের অন্যতম নেতা হিসাবে জগৎকান্তের ডাক পড়ে এবং জগৎকান্ত শ্যামাপ্রসাদের সেই ডাকে সাড়া দেন ও পরে সর্ব্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। তাঁর এই কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী ও শা-নওয়াজ—যখন তাঁহারা শান্তির বাণী প্রচারে দেশে দেশে পাড়ায় পাড়ায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

আবার কলকাতায় ক্রীড়া-জগতের বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি অথবা খেলোয়াড় এলে তখনই জগা শীল তাঁকে এস, ও, পি, সি-তে এনে অভিনন্দন জানানোর ব্যবস্থা করতেন আর সেই সংগে উপহার দিতেন বক্সিং-এর প্রদর্শনী। কেউ কখনও প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি জগা শীলকে, এমনই ছিল তাঁর অপূর্ব বাক্‌চাতুর্য ও আকর্ষণ করার ক্ষমতা।

লোকপ্রিয়তা

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে অন্তরের সংগে ভালবাসতেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা 'বাদলা' বলতে অজ্ঞান, বয়োজ্যেষ্ঠরা জগাকে সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব, সমবয়সীরা জগার সাফল্যে গৌরবান্বিত, পরাজয়ে ম্রিয়মাণ, যুবকরা জগাদার কাছে নানাবিধ ক্রীড়ার উন্নতি করতে উপদেশ ও শিক্ষা পাবার জন্য লালায়িত, কিশোর বালকরা স্যারের কাছ থেকে উৎসাহবাণী পেলে আনন্দাপ্লুত, হর্ষোৎফুল্ল।

তাই জগৎকান্তকে যেতে হত অগণিত প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ ধরনের অনুষ্ঠানে হয় সভাপতি, না হয় প্রধান অতিথিরূপে। যেখানেই যেতেন কার্যকরী উপদেশ দিতেন তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে। অসার বাক্যবর্জিত তাঁর কালধর্মী স্থানোপযোগী বাস্তব চিন্তাপ্রসূত বক্তৃতা বয়স নির্বিশেষে সকলেই অবাক বিস্ময়ে শুনতেন। কখনও কথার খেলাপ করতেন না, কাউকে নিরাশ করতেন না। নিকটে, দূরে, অন্য জেলায়, যেখান থেকেই আমন্ত্রণ আসুক, প্রতিযোগিতা হলে ভোরবেলায়, সভা হলে সবার আগে অপরাহ্ণে হাজির হতেন।

এস. ও, পি, সি ও তাঁর বাসগৃহে প্রতিদিন কত রকমের আবদার নিয়ে কতজনই না আসত। হয় সার্টিফিকেট নিতে, না হয় বাণী নিতে, না হয় চাকুরীর সুরাহার জন্যে কিম্বা তাদের নিজের অথবা পরিবারস্থ ব্যক্তির অসুস্থতার ব্যাপারে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্যে। কাউকে ফেরাতেন না। আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদের যাতে উপকার হয়, তা করতেন। লোকের বিপদে আপদে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে কখনও কখনও সারারাত্রি ধরে ঘুরে ঘুরে যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন। তাই তাঁর লোকপ্রিয়তা অত উচ্চশিখরে উঠেছিল।

উৎসাহদানে

বহু খেলোয়াড়, যাদের আহার বাসের সংস্থান নেই, তাদের শুধু মৌখিক উপদেশদান নয়, উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন হলে চাকুরী জোগাড় করেও দিতেন।

কিন্তু একটি বিষয়ে জগৎকান্ত নির্মম ছিলেন। যদি দেখতেন, কোন উদীয়মান খেলোয়াড় উন্নতি করার প্রধান পদক্ষেপ অনুশীলনে ফাঁকি দিচ্ছে, তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। তাকে এমন ধমক দিতেন, তাড়িয়ে দেবার শাসানি দিতেন, তখন তাঁর আশেপাশে যারা থাকত, তারা জগৎকান্তের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হতেন এবং তাঁর বিরূপ সমালোচনা করতেন, তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলতেন, হয়ত বন্ধুস্থানীয় হলে প্রতিবাদও করতেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, জগা শীলের শিক্ষাদান-প্রথার একটি বড় আঙ্গিকই ছিল উৎসাহদানের অন্তরালে এইসব কঠিন, আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ঠুর বাক্যবাণ। আখেরে ফলপ্রসূ হত। সেই সব নষ্ট আদর্শ খেলোয়াড়দের চেতনার উদ্রেক হত।

বিচারকপদে

তাঁর সফল স্বপ্ন বক্সিং ছাড়াও তিনি ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, অ্যাথলেটিক, সুইমিং, জিমন্যাস্টিক, ওয়েট-লিফটিং ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে বিচারকের কাজ করতেন।

মৃত্যুকাল অবধি তিনি বেঙ্গল রোড রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও কলকাতা রেফারীজ অ্যাসোসিয়েশনের রেফারীদের পরীক্ষক বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। আই, এ, বি, এফ, এ্যামেচার এথলেটিক ফেডারেশন ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন।

বহির্ভারতে

সর্ব্ব বিভাগের ক্রীড়ায় জগৎকান্ত যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন শুধু তাই নয় প্রতিটি খেলার কি ফুটবল, কি ক্রিকেট, কি হকি, কি এ্যাথলেটিক স্পোর্টস বক্সিং, সাঁতার, জিমন্যাষ্টিক ত' বটেই আইনকানুন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকাতে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলে পরিগণিত হতেন। আর সেই কারণেই ১৯৪৮ সালে যখন ভারতবর্ষ থেকে লন্ডন অলিম্পিকে প্রথম বার বক্সিং টীম প্রেরিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে জে, কে, শীলকেই সেই টীমের বিশেষজ্ঞ কোচ করে পাঠান হয়। ১৯৫২ সালে উত্তর ইউরোপের ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতেও ভারতের অলিম্পিক বক্সিং টীমের কোচ হয়ে টীম নিয়ে যান। বক্সিং টিম নিয়ে ওই বছরই বর্মা যান। ভারত-সিংহল (সীলোন) বাৎসরিক স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম বৎসরই অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে এবং তার ২ বৎসর পরে ১৯৬১ সালে ভারতীয় স্কুল বক্সিং টীমের সঙ্গে পরিদর্শক ও বিচারক হয়ে সিংহল ভ্রমণ করেন। এ ছাড়াও নিজ প্রতিষ্ঠান স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচার থেকে একটি পূর্ণাবয়ব টীম যাতে বক্সিং ছাড়াও, জিমন্যাষ্টিক ও বডি বিল্ডিং ছিল নিয়ে নেপাল ভ্রমণের ব্যবস্থা করে ১৯৬৪ সালে সর্ব্বাধিনায়ক হয়ে যান।

পারিবারিক জীবনে

জগৎকান্ত ১৯৩৭ সালে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

বিবাহের তিন বৎসর পর তিনি নতুন গৃহে সংসার পাতেন। কিন্তু তাহা সুখের হয় না। তাঁহার প্রথম দুইটি কন্যা ছয় বৎসরের মধ্যে আকস্মিকভাবে মারা যাওয়াতে তিনি মর্মাহত হন। মাতৃস্থানীয়া ডাঃ মিশ্রের সহধর্মিণীর উপদেশে আবার চাঁপাতলার পৈতৃক বাসগৃহে ফিরিয়া আসেন।

তাঁর চার ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠতম তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ভ্রাতা অতি অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন। পরে তাঁর অগ্রজ মারা যান এবং সাত বৎসর পূর্বে তাঁর পরের ভ্রাতাও মৃত্যুবরণ করেন। এতগুলি প্রিয়জনকে হারানোতে জগৎ-কান্ত শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু অসাধারণ তেজস্বীতা তাঁকে আবার জীবন-যুদ্ধে নামিয়ে দেয়।

শোকাতুর স্ত্রী, ভাগ্যহীন পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও জ্যেষ্ঠ ও অনুজ ভ্রাতার পৌত্রপৌত্রীভরা সংসার রেখে গেছেন।

তিরোধান

জগৎকান্ত তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সফল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায়, কষ্টসাধ্য শ্রমস্বীকার করে, অসাধারণ মনোবলের জোরে আর অদম্য সাহসের বলে। সেইজন্যেই তিনি 'কান্ত' হতে পেরেছিলেন জগৎ অর্থে ক্রীড়াজগতের ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে। সার্থক করেছেন তাঁর জগৎকান্ত নামকে।

নাতিদীর্ঘ জীবনটাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেমন তিনি বক্সিংকে ধ্যান-জ্ঞান করেছিলেন, তেমনি জীবনক্ষেত্রটিকে বক্সিং রিঙ ধরে তাঁর যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। আর সেই জাতীয় বক্সিংয়ের আসরেই জব্বলপুরে গত ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সাপ্তাহিক "দেশ"র অনুরাগী, ক্রীড়া-সাংবাদিক তাঁর মৃত্যু-বর্ণনাটি অবিস্মরণীয় করেছেন, 'রিং-এর পাশেই মহাকালের এক আচমকা মুষ্ঠ্যাঘাতে পৃথিবী থেকে নক্-আউট হয়েছেন অতীতদিনের খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা।'

মুষ্টিযোদ্ধার উপযোগী মৃত্যুই বরণ করে চলে গেলেন তাঁর প্রিয় বক্সিং, এস, ও পি, সি, অগণিত ছাত্র, ততোধিক ভক্ত, স্নেহভাজন আর পরমাত্মীয়দের ছেড়ে। কিন্তু তাঁর আদর্শ হবে না নষ্ট চিরন্তন থাকবে—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর বাণীর সামান্য বদল করে উচ্চারণ করা যায়—

"জীবনে যাহা তুমি রাখিলে পিছে,

জানি মোরা জানি তাও হবে না মিছে।"

ওঁ শান্তি

With Chief Minister of West Bengal, Shri Bidhan Chandra Roy and minister Shri Kalipada Mukherjee, in a event of five kilometer run

With the officials in Richmond Park 1948, London Olympics

In a light mood with Duke of Edinburgh

In the last event of his life,JK Seal welcoming Governor of West Bengal Shri Dharam Vir on 26th December 1968, just three weeks before his death

With some american negro boxers, 1942
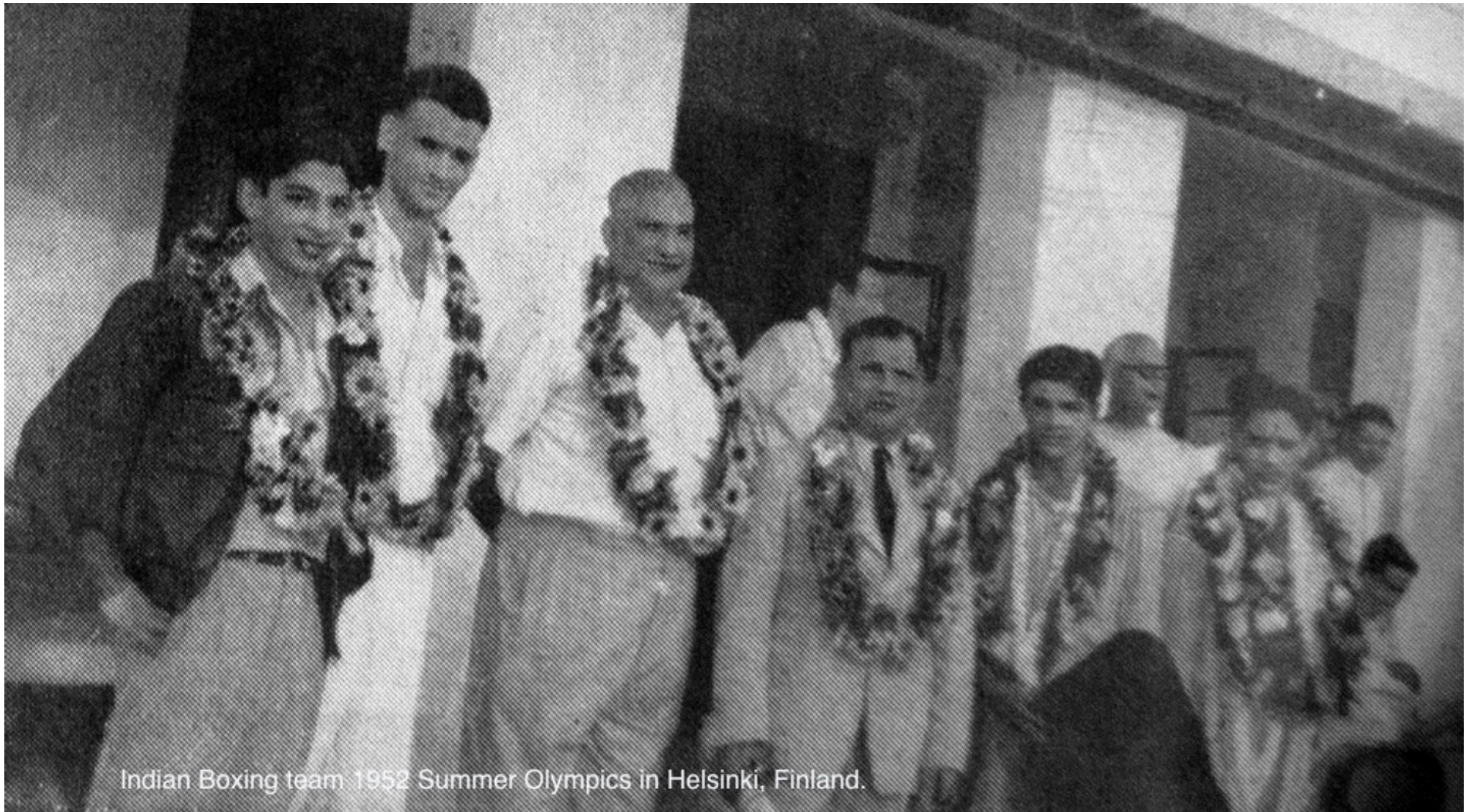
Indian Boxing team 1952 Summer Olympics in Helsinki, Finland.

1959, with Indian
Boxing team,
Colombo
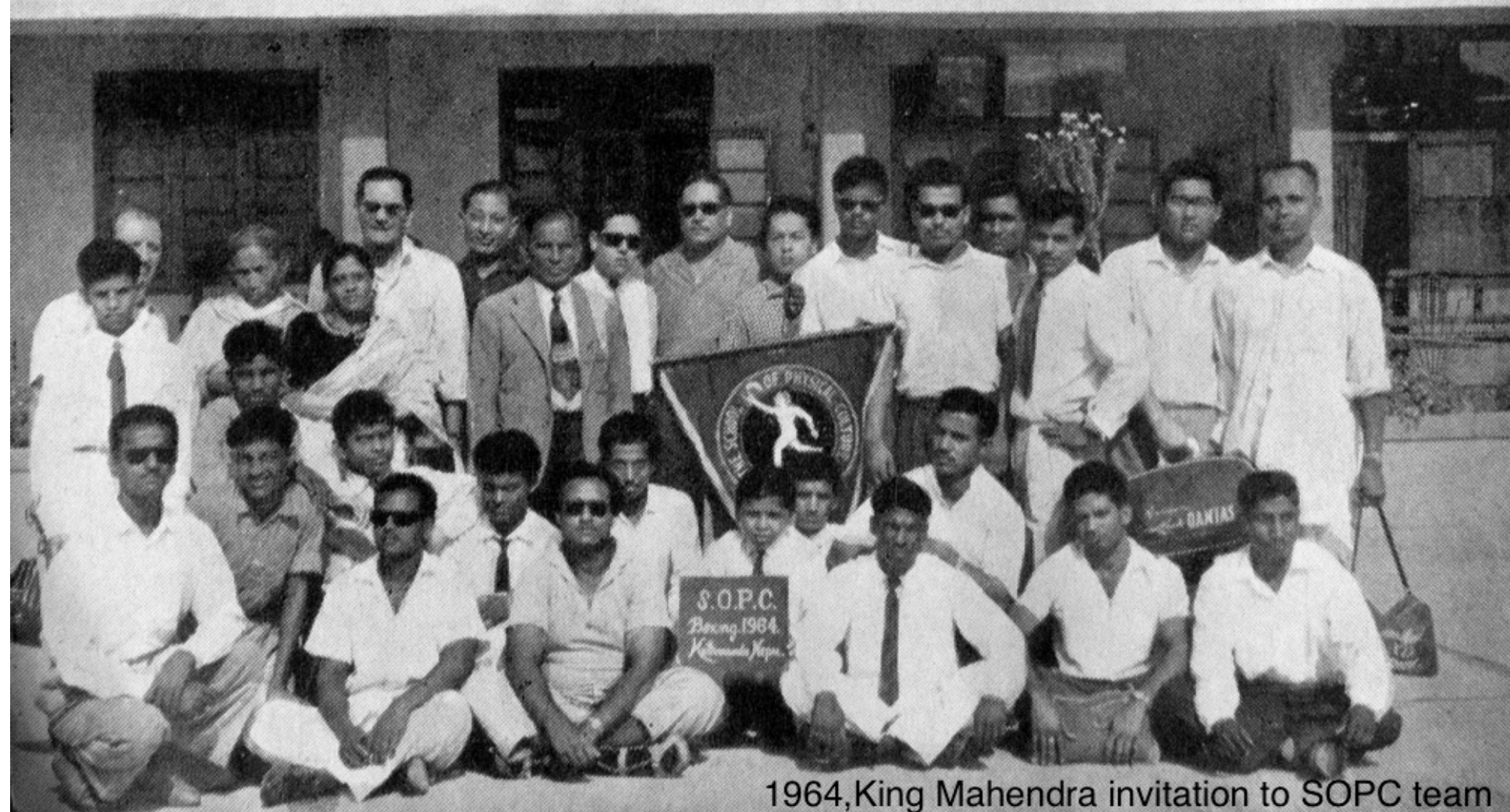
1964,King Mahendra invitation to SOPC team

With a Japanese Referee In 1951, First Asian Games
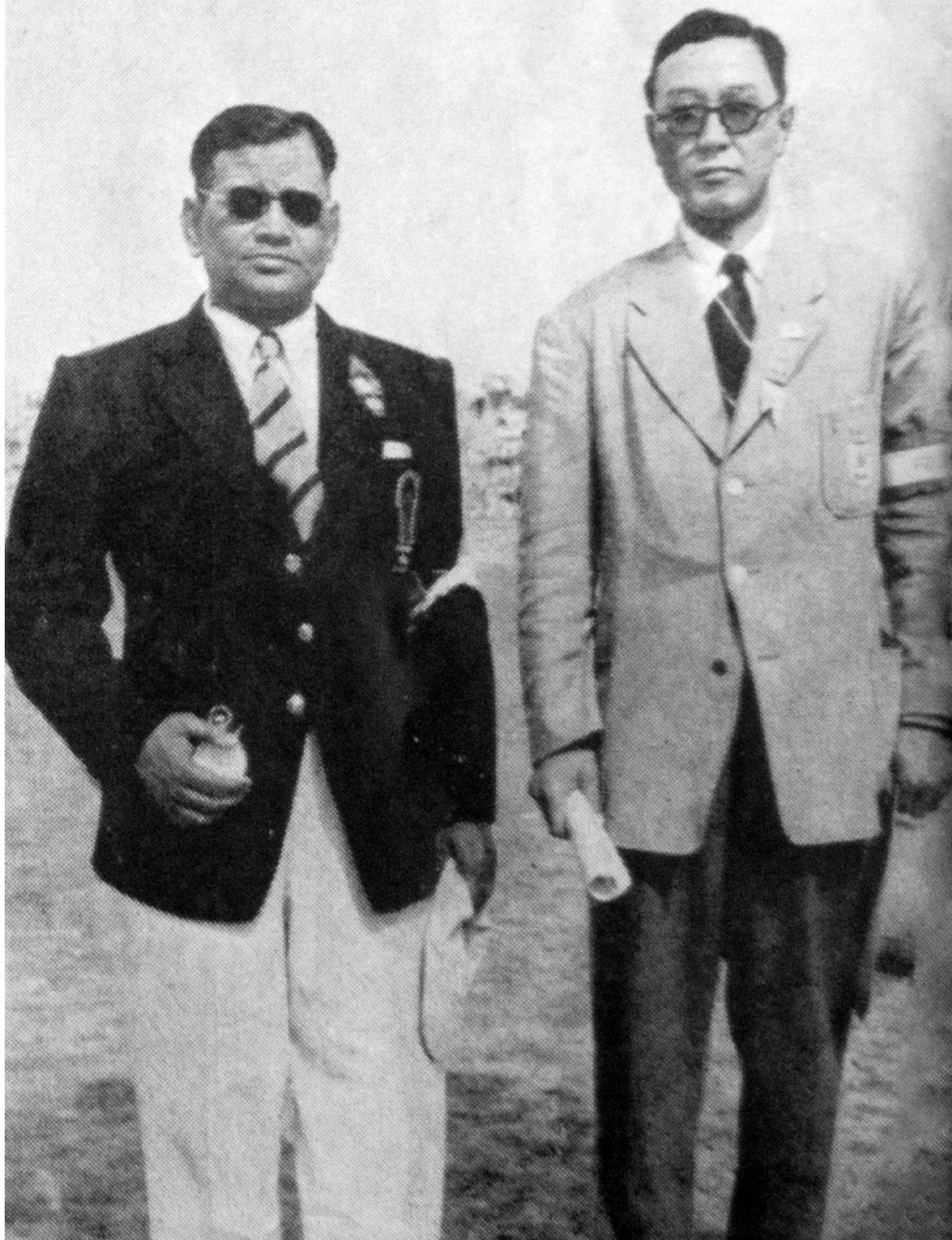
With Emil Zátopek and his wife in SOPC